বেঙ্গল টাইমস

১ এপ্রিল, ২০২৬

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সূচিপত্র

রাজনীতি

চমক নেই, এটাই বড় চমক

❑ রক্তিম মিত্র

এবার আর কারও দম বন্ধ হচ্ছে না তো!

❑ অজয় কুমার

সাহিত্য

এগিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা সিনেমাকেও

❑ বিপ্লব মিশ্র

গোয়েন্দা কাহিনিও লিখেছিলেন আশাপূর্ণা

❑ শোভন চন্দ

গল্প

বক্সার দুর্গে

❑ সৌর্য সিনহা

খেলা

ক্রিকেট বিনোদনের পথে একধাপ

❑ ধীমান সাহা

গম্ভীর নিজেই তো তারকা হতে চাইছেন

❑ ধীমান সাহা

কপিলদের তাহলে মনে পড়ল!

❑ নির্মল দত্ত

বিনোদন

সেই তো থ্রিলার আর ভূত

❑ শর্মিষ্ঠা কুণ্ডু

ভ্রমণ

স্নিগ্ধ গ্রাম কোলাখাম

সুব্রত মণ্ডল

কুয়াশাঘেরা পাবং

নূপুর রায়

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৫। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১,

ই-মেল: bengaltimes.in@gmail.com

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

ভোটের দামামা

ক্যালেন্ডারে বসন্ত এখনও বিদায় নেয়নি। কিন্তু ভোটের দামামা একবার বেজে গেলে আর বসন্ত থাকে না। প্রচারের উত্তাপ এসে পড়ে জীবনের আনাচে-কানাচে। চায়ের দোকান থেকে বাস-ট্রেন। দেওয়াল লিখন থেকে ফ্লেক্স-হোর্ডিং, সবাই বুঝিয়ে দিচ্ছে ভোট এসে গেছে। টিভি খুললেই তীব্র চিৎকার। কাগজেও ভোট ছাড়া খবর নেই। আর সোশ্যাল মিডিয়া তো অনবরত নানা ছবি, লেখা ও ভিডিও উগরে দিচ্ছে।

প্রার্থী তালিকা ঘোষণায় এবার সবার আগে বিজেপি। পুরো তালিকা না হোক, অন্তত প্রথম দফার তালিকা তারা আগেই জানিয়ে দিয়েছে। তারপরই তৃণমূল। তারা অবশ্য অনেক আগেই তালিকা তৈরি করে ফেলেছিল। কৌশলগত কারণেই প্রকাশ করতে কিছুটা

দেরি। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই হিসেবি। বিনোদন জগতের তারকাদের কিছুটা যেন ব্রাত্যই রাখা হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির তালিকায় ‘প্রাক্তন তৃণমূল’ প্রার্থীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় কম। ভুল থেকে তাঁরাও কিছুটা শিক্ষা নিয়েছেন। বামেদের প্রার্থীতালিকায় একঝাঁক ঝকঝকে তরুণ মুখ। যাঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত, দারুণ কথা বলেন, জনমানসে ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল। কিন্তু তারপরেও ভোটের বাক্সে কতটা প্রভাব পড়বে, তা সময় বলবে।

শাসক ও মূল বিরোধী, দুই শিবির যেন অদ্ভুত মেরুকরণে ব্যস্ত। এমন মেরুকরণের আবহে ভোট বাংলায় আগে কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। এই ধর্মীয় মেরুকরণ ভাঙতেই তৃতীয় শিবিরের উত্থান খুব জরুরি ছিল। বাম-কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হলে হয়তো কয়েকটা আসনের সম্ভাবনা তৈরি হত। জোট না হওয়ায় তৃতীয় বিকল্প আরও কিছুটা যেন আবছা হয়ে গেল।

চমক নেই, এটাই বড় চমক

রক্তিম মিত্র

অনেকেই ভাবছিলেন, বিরাট কোনও চমক থাকবে। অনেক হেভিওয়েট হয়তো বাদ পড়বেন। বিনোদন জগতের অনেক তারকা হয়তো প্রার্থী হয়ে যাবেন। বাস্তবে তেমন কিছুই দেখা গেল না। চমক নেই, এটাই বড় চমক।

আসলে, যাঁকে তাঁকে, যেখান থেকে হোক দাঁড় করিয়ে দাও। গত দেড় দশক ধরে এটাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি রাজনীতির কিছু বুঝুন বা না বুঝুন, একটাই বুলি শোনা যেত, মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। এমন লোকেরা অনেক সময় জিতেও যেতেন। পাঁচ বছর ধরে এলাকার মানুষকে এই অর্বাচীনদের হজম করতে হত।

বলতে দ্বিধা নেই, এবারের প্রার্থী তালিকায় সেই অর্বাচীনদের ভিড় অনেকটাই কম। এটা অবশ্যই ভাল দিক। তাৎক্ষণিক দলবদলুদের ভিড় কম। এটাও একটা ভাল দিক। সত্যি কথা বলতে গেলে, তৃণমূলের পক্ষে এর থেকে ভাল প্রার্থী তালিকা আর কীই বা হতে পারত!

অনেকে ভেবে নিয়েছিলেন, পুরনোদের অনেকেই বাদ পড়বেন। এসব জল্পনা তুলে হাওয়া গরম করা যায়। কিছু ইউটিউব চ্যানেলের ভিউয়ার বাড়ানো যায়। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হওয়ার ছিল না। পুরনোদের মমতা ব্যানার্জি এক কথায় ছেঁটে ফেলবেন, এমনটা যাঁরা মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে বাস্তবের যোগসূত্র বড়ই কম। আবার নতুন মুখেদের জায়গা হবে, এটাও মোটামুটি জানাই ছিল। সবমিলিয়ে পুরনো আর নতুনের মোটামুটি একটা ভারসাম্য আছে।

একেবারে দাগিদের কেউ কেউ বাদ পড়েছেন। যথা, পার্থ চ্যাটার্জি, মানিক ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহা ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু টাকার জোরে প্রার্থী হয়েছেন, এমন নাম যেমন আছে, পাশাপাশি কোনও আনুগত্যকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এমন উদাহরণও অজস্র।

কোনও সন্দেহ নেই, এবার তৃণমূলের তালিকা অনেক বেশি দায়িত্ববোধেরই পরিচয় দিয়েছে। কোনও দল দীর্ঘদিন শাসনক্ষমতায় থাকলে তার সামনে নানা চ্যালেঞ্জ এসে হাজির হয়। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া তো থাকেই। কোথাও দুর্নীতি, কোথাও ঔদ্ধত্যও লাগামছাড়া যায়। তালিকায় চোখ বোলালেই বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরে নানা সমীক্ষা চালিয়ে, নানা স্তরের মানুষের মতামত নিয়ে এই তালিকা তৈরি হয়েছে। কাউকে প্রার্থী করার ক্ষেত্রে বা কাউকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও দীর্ঘ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে।

প্রথমত, যাঁদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিযোগ আছে, এমন অধিকাংশ বিধায়ককেই আর টিকিট দেওয়া হয়নি। এটাও একটা ইতিবাচক বার্তা। কাউকে কাউকে প্রার্থী করা হলেও কেন্দ্র বদল করা হয়েছে। অর্থাৎ, স্থানীয় মানুষের অভিযোগকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। বিনোদন জগতের লোকেদের উপস্থিতি এবার তুলনামূলক কম। যাঁরা ছিলেন, অথচ ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করছিলেন না, তাঁদের অনেককেই অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। নতুন করে কাউকে টিকিট দেওয়া হয়নি। এটাও একটা ইতিবাচক বার্তা।

অনেকে ক্ষুব্ধ হবেন, অনেকে দল ছাড়ার হুমকিও দেবেন। কিন্তু এইসব

ফাঁপা হুমকির মেয়াদ একদিন বা দুদিন। দ্রুত তাঁরা বুঝে যাবেন, যাঁদের অনুগামী মনে করেছিলেন, তাঁদের কেউই পাশে নেই। অনেকে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এবার বিশেষ হালে পানি পাবেন না। কারণ, এবার বিজেপিও দলবদলুদের ঢালাও টিকিট দেবে না। ফলে, বিদ্রোহ অচিরেই ফিকে হয়ে যাবে। তাঁরা যে সাবোতাজ করবেন, সেই ক্ষমতাটুকুও নেই। বেসুরো গাইলে কী হতে পারে, তাঁরা ভালই বোঝেন। আইপ্যাকও ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়বে। এখন দলের মূলস্রোতে থাকলে পরে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে, সেই অঙ্ক বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

ফলে, বাদ যাওয়া বিধায়কদের এই ক্ষোভ বিক্ষোভ দু-তিনদিন টিভি আর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করবে। তারপর অচিরেই মিলিয়ে যাবে। কোনও সন্দেহ নেই, প্রার্থী নির্বাচনের সাংগঠনিক প্রস্তুতিতে এবার তৃণমূল অনেক এগিয়ে। সঙ্গে আইপ্যাক, পুলিশ, মিডিয়া তো আছেই। অর্থবল, বাহুবলেরও অভাব নেই।

নির্বাচন কমিশন! যতই গর্জন করুক, তারা আসলে সিবিআই আর ইডির মতোই অশ্বডিম্ব প্রসব করবে। তাঁরা কতখানি অপদার্থ হতে পারেন, এসআইআর কাণ্ডে তা বেশ ভালমতোই বোঝা গেছে। আপাতত নানা অফিসারকে বদলি করে কিছুটা হাওয়া গরম করার চেষ্টা হবে। নির্বাচন এগিয়ে আসুক, তখন বুঝতে পারবেন কেন্দ্রীয় বাহিনী আর নির্বাচন কমিশন সেই আগের ধারাবাহিকতাই বজায় রেখেছে।

এবার আর কারও দম বন্ধ হচ্ছে না তো!

অজয় কুমার

এবার আর তেমন দম বন্ধ নেই। কারও নিশ্বাস নিতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না। কারণটা পরিষ্কার। বিজেপি মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়েছিল, এবার তৃণমূল থেকে আসা টিকিট না পাওয়া প্রার্থীদের জন্য ঢালাও দরজা খোলা থাকবে না। হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসে টিকিট নিয়ে চলে গেলাম, এবার আর তেমনটা হবে না। গোপনে কেউ কেউ যে যোগাযোগ করেননি, এমন নয়। দরজায় ঝাক্কা না হোক, টোকা তো নিশ্চিতভাবেই মেরেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু দরজা খুলবে না বুঝে, আবার ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেছেন।

তৃণমূলের আগেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিল বিজেপি। এটা নিশ্চিতভাবে বড় পদক্ষেপ। আইপ্যাক আসার পর তৃণমূল এখন

অনেকটাই গোছানো। অনেক আগে থেকেই প্রাথমিকভাবে প্রার্থীতালিকা তৈরি। যাঁরা টিকিট পেতে পারেন, তাঁদের কাছে গোপনে বার্তাও চলে গেছে। কারা বাদ পড়তে পারেন, তাও মোটামুটি অনেকটাই ঠিক হয়ে আছে। তবু প্রার্থীঘোষণায় বিজেপির থেকে পিছিয়ে কেন? কিছুটা সতর্কতা থেকেই এমন বিলম্ব। আসলে, টিকিট না পেলেই অনেকে বিজেপি-তে ভিড়তে পারেন, এমন একটা আশঙ্কা তো ছিলই। বিজেপি যদি আগে ঘোষণা করে দেয়, তাহলে সেই সম্ভাবনা অনেকটাই কম। হয়তো সেই কারণেই অপেক্ষা, আগে বিজেপি ঘোষণা করুক। তাছাড়া, বিজেপি ঘোষণার পর তালিকা ঘোষণা হওয়ার একটা বাড়তি সুবিধাও আছে। কাকে কোথায় প্রার্থী করা হচ্ছে, সেটা বুঝে নিয়ে শেষপর্বে দু-একটা অদল-বদলও করা যাবে।

বিজেপির বড় চমক অবশ্যই শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবেন, তা তো জানাই ছিল। কিন্তু পাশাপাশি ভবানীপুরেও তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বড়সড় ঝুঁকিই নিয়েছে বিজেপি। কোনও সন্দেহ নেই, শুভেন্দু নিজেও যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আগেরবার মমতা ব্যানার্জির নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে যতটা সাহসিকতার পরিচায় দিয়েছিলেন, শুভেন্দুর এই ভূমিকা আরও বেশি দুঃসাহসী। ভবানীপুরে যতই তৃণমূলের দাপট থাকুক, শুভেন্দুর এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিতভাবেই চাপ বাড়বে। বিজেপির আর কেউ এমন ঝুঁকি নিতেন বলে মনে হয় না।

তৃণমূল থেকে শেষপর্বে এসে যোগ দেওয়া নেতাদের নাম যে থাকবে না, এটা মোটামুটি জানাই ছিল। এমনকী রুপোলি পর্দার তারকাদের ভিড়ও এবার নেই। যাঁরা বিজেপির পরিচিত মুখ, তাঁরাই প্রার্থী। পাঁচবছর আগে তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের ঝাঁকে ঝাঁকে টিকিট দিয়ে যে ভুল করেছিল, এবার তার পুনরাবৃত্তি নেই। হয়তো প্রার্থীরা অনেকেই অখ্যাত, অপরিচিত। কিন্তু এলাকার নানা সমীকরণে তাঁরা লড়াই করতে পারবেন। যদিও পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। কয়েকটি আসনে নাম ঘোষণা এখনও বাকি। সমাজের বিশিষ্ট কিছু মানুষকে প্রার্থী করার চেষ্টা হতে পারে। তবে সেখানেও বড় কোনও চমক না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আসলে, চমক না থাকাটাই এবার চমক। সব দলই ভরসা রাখছেন রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর। তারকাদের এনে ভিড় করার থেকে দলের পুরনো লোকেদের টিকিট দেওয়া অনেক ভাল।

বিজেপি কতদূর যাবে, সংশয় থাকবেই। এসআইআর কতটা সুফল দেবে, কতটা বিপাকে ফেলবে, তা নিয়েও কৌতূহল থাকবে। কিন্তু দল ভাঙিয়ে প্রার্থী করার প্রবণতা যে কমেছে, এটা বাংলার গণতন্ত্রের পক্ষে নিঃসন্দেহে ইতিবাচক একটা দিক।

শুধু সাহিত্য নয়, এগিয়ে দিয়েছেন বাংলা সিনেমাকেও

বিপ্লব মিশ্র

সত্যজিৎ রায় যদি ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ছবি না বানাতেন, তাহলে কি সাহিত্যিক হিসেবে বিভূতিভূষণ এতখানি প্রতিষ্ঠা পেতেন? প্রশ্নটা উল্টোভাবেও করা যায়। বিভূতিভূষণ যদি এই কালজয়ী উপন্যাস না লিখতেন, বা সত্যজিৎ রায় যদি অন্য কোনও গল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করতেন, তিনি কি এই খ্যাতি পেতেন? এ অনেকটা ডিম আগে না মুরগি আগের মতোই প্রশ্ন।

কার জন্য কে বিখ্যাত, সেই বিতর্ক বরং মুলতুবি থাক। তার থেকে সাহিত্য আর সিনেমা হাতে হাত রেখে চললে উভয়েরই মঙ্গল, এই সহজ সত্যিকে মেনে নেওয়াই ভাল। সদ্যপ্রয়াত সাহিত্যিক শংকরের কথাই ধরা যাক। শঙ্কর বললেই সবার আগে মনে পড়ে ‘চৌরঙ্গী’র কথা। বইটির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কতগুলি সংস্করণ হয়েছে, তা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতোই। এখানেও সেই প্রশ্ন অনিবার্য, এটি যদি সিনেমা না হত, স্যাটা বোসের চরিত্র উত্তম কুমার যদি এমন প্রাণবন্ত অভিনয় না করতেন, তাহলে কি উপন্যাসটি এত জনপ্রিয় হত?

চৌরঙ্গী তাঁর একেবারেই প্রথম দিকের লেখা। ছয়ের দশকের উপন্যাস। ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ছয়ের দশকেই তাকে নিয়ে ছবি করেন পিনাকী ভূষণ মুখোপাধ্যায়। কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলের পটভূমিতে মানুষের সম্পর্ক, উচ্চবিত্ত সমাজের ভেতরের দ্বন্দ্ব এবং একাকিত্বের গল্পকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পর্দায় তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে এই একই উপন্যাস থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি হয় শাহজাহান রিজেন্সি, যার পরিচালক সৃজিত মুখার্জি। এই ছবিতে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটির ভাবনাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শংকর (মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়)–এর উপন্যাস থেকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বাংলা সিনেমা নির্মিত হয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন, কর্পোরেট সংস্কৃতি, চাকরির সংকট এবং মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই বিষয়গুলো তাঁর লেখাকে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফলে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গড়ে উঠেছে তাঁর রচনাকে কেন্দ্র করে।

শংকরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস কোম্পানি লিমিটেড অবলম্বনে তৈরি হয় সীমাবদ্ধ। এই ছবির পরিচালক ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। কর্পোরেট জগতে একজন সফল মানুষের নৈতিক সংকট এবং সামাজিক অবস্থানের প্রশ্নকে রায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। একইভাবে শংকরের আরেকটি উপন্যাস জন অরণ্য থেকে তৈরি হয় জন অরণ্য, এটিও পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। এই ছবিতে শিক্ষিত বেকার যুবকের সংগ্রাম

এবং শহুরে সমাজের কঠিন বাস্তবতা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে উঠে আসে।

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শংকরের উপন্যাসগুলোর একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর লেখার ভাষা সহজ হলেও বিষয়বস্তু গভীর এবং অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। বিশেষ করে কলকাতাকেন্দ্রিক জীবন, চাকরির চাপ, সামাজিক বৈষম্য এবং মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব—এই বিষয়গুলো চলচ্চিত্রের জন্য খুবই উপযুক্ত উপাদান হয়ে ওঠে। ফলে পরিচালকরা তাঁর লেখাকে শুধু গল্প হিসেবে নয়, বরং সময়ের দলিল হিসেবেও ব্যবহার করেছেন।

বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের মতো একজন বিশ্বমানের পরিচালক যখন শংকরের উপন্যাস নিয়ে কাজ করেন, তখন সাহিত্য ও সিনেমার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি শুধু গল্পকে পর্দায় তুলে ধরেননি, বরং চরিত্রগুলোর মানসিক জটিলতাকে দৃশ্যের মাধ্যমে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পিনাকী ভূষণ মুখোপাধ্যায় বা সৃজিত মুখার্জির মতো পরিচালকরা একই সাহিত্যকেই ভিন্ন সময় ও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। এর ফলে বোঝা যায়, একটি শক্তিশালী সাহিত্যকর্ম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যাখ্যা পেতে পারে।

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের এই ধারাটি বাংলা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শংকরের উপন্যাসগুলো তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর লেখার ভেতরে যে বাস্তবতা, সামাজিক পর্যবেক্ষণ এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব রয়েছে, তা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বারবার অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে বলা যায়, শংকরের সাহিত্য শুধু পাঠকের মন জয় করেনি, বাংলা সিনেমার ইতিহাসেও এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তৈরি করে নিয়েছে।

গল্প

বক্সার দুর্গে

সৌর্য সিনহা

ডুয়ার্সের আকাশে ভোরের নরম আলো। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা কুয়াশা তখনও পুরোপুরি সরেনি। রাজাভাতখাওয়ার ছোট্ট স্টেশনটা যেন অন্য এক সময়ের গল্প বলে। সবুজে ঘেরা, প্রায় নির্জন, দূরে চা-বাগানের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় কুঁড়ে-ঘর। ট্রেন দিনে কয়েকবার মাত্র থামে। তবু স্টেশনের লালচে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে অর্ণবের মনে হয়, যেন কোনও অজানা কবিতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

জয়িতা পাশে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, ‘তুমি বড্ড আবেগপ্রবণ, অর্ণব। একটা স্টেশনকেও কবিতা ভেবে ফেলছো!’

অর্ণব মৃদু হাসল। সে সাহিত্যের শিক্ষক, কথায় কথায় রূপক খুঁজে নেয়। জয়িতা

ইঞ্জিনিয়ার, তার আবার এত আবেগ নেই। সে বোঝে ডেটা। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, দুজনের দাম্পত্য জীবন মন্দ যাচ্ছে না। কিন্তু কোথাও কোথাও যেন অদৃশ্য একটা দূরত্ব রয়ে গেছে।

রাজাভাতখাওয়ায় কাটল কয়েকটা দিন— অলস দুপুর, বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা, নির্জন স্টেশনে বসে থাকা। স্টেশনটা বেশ অদ্ভুত। চারপাশে জঙ্গল। মাঝখানে যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তিক এই স্টেশন। স্টেশনের পাশেই একটা ভাতের হোটেল। দোকানের মালিককে সবাই বুলুদা বলে। সবসময় হাসিমুখ। আপাদমস্তক একজন সরল মনের মানুষ। কোনও প্যাঁচালো ব্যাপার নেই। টুরিস্টদের সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দেয়। হাতির নানা কর্মকাণ্ড বলে যায়। বুলুদার দোকানের পেছনে ওর দাদা পরিমলের হোম স্টে। সেই হোম স্টে–র পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ঝোরা। দিব্যি স্নানও করা যায়। ঝোরার ওপারেই জঙ্গল।

স্টেশনের আরেক পাশে জঙ্গল লজ। নামের শেষে লজ থাকলেও মোটেই প্রাইভেট নয়। এটা বনদপ্তরের বাংলো। যে কেউ বুকিং করতে পারে। অর্ণবরা আপাতত সেখানেই উঠেছে। বিশাল এলাকাজুড়ে এই বাংলো। পাশেই একটা কাঠের বাংলো। লিও কটেজ। আপাতত পরিত্যক্ত। করোনার সময় এখানেই কয়েকজনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল। তারপর থেকে আর সংস্কার হয়নি। কিন্তু এই বাংলোর উপরের বারান্দায় বসে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকার রোমাঞ্চই আলাদা।

অর্ণবের কিন্তু বেশ ভালই লাগছে। দুজন মিলে আপনমনে লিও কটেজের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ইচ্ছেমতো চায়ের দোকানে বসে পড়ছে। জয়িতা গুনগুন করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা এখানে নেই। এই আলস্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার মতোই।

তারপর তারা গেল বক্সায়। বক্সা যাওয়াটা অবশ্য তাদের ট্যুর প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। বুলুদার মুখে এই দুদিন বক্সা পাহাড়ের এত গল্প শুনেছে, জয়তীই জেদ ধরল, চলো, এতদূর যখন এসেছি, সেই দুর্গ দেখেই যাই।

দুই

অটো রিজার্ভ করে ওরা গেল সান্তালাবাড়ি পর্যন্ত। সেখান থেকে পায়ে হেঁটেই উঠতে হবে। পাহাড়ি রাস্তা, আঁকাবাঁকা পথ, চারপাশে ঘন অরণ্য। মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে যাচ্ছে। উঁচু পাথরে একটু করে জিরিয়ে নেওয়া। ওদের পাশ কাটিয়ে কেউ উঠছে মাথায় গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে। কারও মাথায় আবার ইয়াবৃড় ব্যাগ। এত দুর্গম জায়গায় ওরা রোজ এভাবে ওঠে!

অর্ণব–জয়িতা যখন উঠছে, তখন কেউ

কেউ আবার নেমেও আসছে। অর্ণব মাঝে মাঝেই জানতে চাইছে, আর কত দূর? এক মাঝবয়সী যুবক বলে উঠলেন, ‘দাদা, দিল্লি বহুদূর। সবে তো তিরিশ পারসেন্ট এসেছেন। এখনও সত্তর পারসেন্ট বাকি।’ বড্ড বেআক্কেলে লোক। আরে বাবা, তুই না হয় উঠেছিস। তাই বলে লোককে এভাবে ডিমোটিভেট করার কোনও মানে হয়!

পেছন থেকে নেমে আসছিলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। বয়স অন্তত পঁয়ষট্টি তো হবেই। উনি এসে কিছুটা ভরসা দিলেন, ‘ইয়ং ম্যান, আমি পারলাম, আপনারা পারবেন না? ঠিক পারবেন। এতদূর যখন এসে পড়েছেন, তখন ফিরে যাবেন না। একটু হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু বক্সা বিজয়ের আনন্দই আলাদা। আজ ফিরে গেলে এই আনন্দ থেকে সারাজীবন বঞ্চিত থেকে যাবেন।’

বৃদ্ধের কথায় কিছুটা যেন ভরসা পেল অর্ণব–জয়িতা। অর্ণব তবু একবার জয়িতার দিকে তাকাল। ইঙ্গিতে জানতে চাইল, পারবে তো? জয়িতা বলে উঠল, ‘চলো ইয়ং ম্যান, সবাই যখন পারছে, আমরাও পারব। তাছাড়া, এলাম যখন, মাঝপথে ফিরে যাব কেন?’

উঠতে উঠতেই অর্ণবের মনে পড়ে গেল, এই বক্সায় দীর্ঘদিন বন্দি ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ‘মেঘের গায়ে জেলখানা’ শিরোনামে চমৎকার একটা লেখা লিখেছিলেন। স্বাধীনতার আগে এখানেই বিপ্লবীদের বন্দি রাখত ইংরেজরা

ওই তো, একটা ভাঙাচোরা দুর্গ দেখা যাচ্ছে। তার মানে, ওরা কাছাকাছি এসেই গেছে।

তিন

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। হঠাৎ একটা দোকান চোখে পড়ল। বাঁশের টেবিল। বেশ কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার পাতা।

দুজনেরই মনে হল, একটু জিরিয়ে নিলে মন্দ হয় না। সেই সান্তালাবাড়িতে কয়েকটা মোমো খেয়েছে। সে তো কখন হজম হয়ে গেছে। মেনু কার্ডে চোখ বোলাতে গিয়ে যেন কিছুটা বিস্ময়। মোমো, নুডলস, চিকেন পকোড়া, ফ্রায়েড রাইস— প্রায় সবই পাওয়া যাচ্ছে। চা, কফি, কোল্ড ড্রিঙ্কস তো আছেই। এমন দুর্গম জায়গা, যেখানে কোনও গাড়ি ওঠে না, সেখানের এক ছোট্ট ঝুপড়ি দোকানেও কিনা এত খাদ্যের সম্ভার! দামও বেশি নয়, সমতলের মতোই। ওরা ম্যাগি আর কফি অর্ডার করল। জয়িতা বলল, ডিম সেদ্ধ হলে কেমন হয়! জয়িতা যতই কর্পোরেট সেক্টরে চাকরি করুক, এই ডিম সেদ্ধ নিয়ে অদ্ভুত একটা দুর্বলতা আছে, সেটা অর্ণব জানে। তাই দুজনের দুটো নয়, বরং চারটে ডিমের কথা বলল। জয়িতার

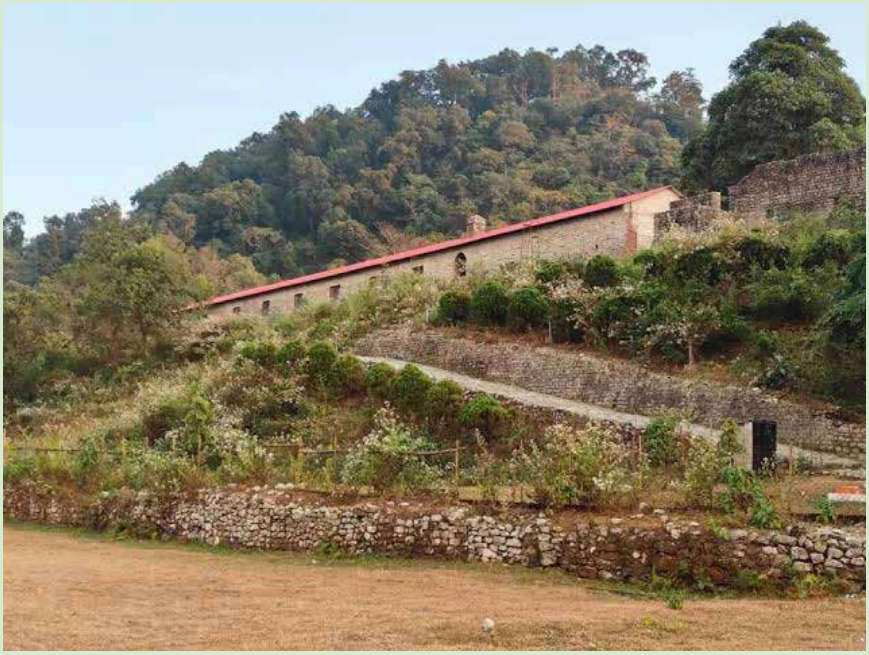

হাসিতেই বোঝা গেল, তার বেশ সমর্থন আছে। চারটে করে আটটা ডিম বললেও বোধ হয় আপত্তি করত না।

খাওয়া পর্বের মাঝেই ওই মাসির কাছে দুর্গের ইতিহাস জানতে চাইল। মাসি বললেন, ‘এখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকেও বন্দি রাখা হয়েছিল। সেই সেলটা এখনও আছে।’ শুনেই যেন গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল অর্ণবের। এখানে নেতাজি বন্দি ছিলেন! সত্যিই, না এলে অনেক আক্ষেপ থেকে যেত।

দুর্গে সংস্কারের কাজ চলছে। জয়িতা বলল, ‘রেনোভেশন হচ্ছে, ভাল কথা। কিন্তু ভয় হয়, এটাকেও পাছে কংক্রিটের জঙ্গল না বানিয়ে দেয়। এখানেও টাইলস না বসিয়ে দেয়!’

একে একে সেলগুলো ঘুরে দেখল। একজন গাইড অন্যান্য টুরিস্টদের বুঝিয়ে চলেছেন বক্সার ইতিহাস। তিনিও বললেন, এই সেলে নেতাজি বন্দি ছিলেন। লোহার গরাদের তলা দিয়ে খাবার দেওয়া হত। ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে এই জেল থেকে তিনি পালিয়েছিলেন। ভুটানি সেপাইরা নেতাজিকে ঘোড়ায় চাপিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

অর্ণব বুঝল, গাইড মশাই বিস্তর জল মেশাচ্ছেন। গল্পের গরুকে গাছে তুলে দিচ্ছেন। এটুকু অতিরঞ্জন ক্ষমা করে দেওয়াই যায়। জয়তি একটা পাথরের টুকরো নিয়ে ব্যাগে ভরল। নেতাজির সেলের কিছু স্মৃতিচিহ্ন সে বয়ে নিয়ে যেতে চায়।

চার

একটু দূরেই একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে নাকি হেলিপ্যাড ছিল। হেলিকপ্টারে আসতেন ব্রিটিশ সাহেবরা। সেখানেও বেশ কয়েকজন টুরিস্ট। কেউ সেই হেলিপ্যাডের ছবি তুলছেন। কেউ আবার হেলিপ্যাডকে পেছনে রেখে সেলফি তোলায় ব্যস্ত।

দূর থেকে এক মহিলাকে দেখে অর্ণবের বুক কেঁপে উঠল। সে কি সত্যিই পর্ণশ্রী? কলেজ জীবনের পরিচিত মুখ?

ছবি তোলার ফাঁকে পর্ণশ্রীরও নজর এড়ায়নি। সেও বুঝতে পারল, এ ঠিক অর্ণব। আর অর্ণব যেভাবে তার দিকে তাকাচ্ছিল, তাতে সে আরও নিশ্চত হল। তবু প্রশ্ন ছুড়ে দিল, 'অর্ণব?'
যাক, অর্ণবেরও আর সংশয় রইল না। এ সেই হারিয়ে যাওয়া পর্ণশ্রী। ফেসবুকে মাঝে মাঝেই খুঁজেছে। কিন্তু বিয়ের পর তার পদবী কী হয়েছে, জানে না। এমন কত পর্ণশ্রী আছে। ফলে, হাল ছেড়ে দিয়েছে।

এক মুহূর্তের জন্য সময় থেমে গেল। অর্ণবের মনে ভেসে উঠল তাদের কলেজের দিনগুলো। দুজনেই জানত, তাদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের হলেও, টানটা যেন নিছক বন্ধুত্বের চেয়ে কিছুটা বেশিই। কিন্তু সাহস করে কেউই কোনওদিন প্রকাশ করতে পারেনি। দল বেঁধে সিনেমায় গেছে। রেস্তোরাঁয় গেছে। কিন্তু দুজনে মিলে কখনও যাওয়া হয়নি। কেউই কাউকে প্রস্তাবটা দিয়ে উঠতে পারেনি। কখনও পরিস্থিতি, কখনও ভীরুতা, কখনও আবার ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা— সবকিছু মিলে সম্পর্কটা যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে গিয়েছিল।

আজ এত বছর পর পাহাড়ি বক্সায় হঠাৎ দেখা। দুজনেই একটু অপ্রস্তুত, আবার আনন্দিতও।

জয়িতা তখন কাছাকাছি ছবি তুলছিল। অর্ণব দ্রুত পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার কলেজ ফ্রেন্ড, পর্ণশ্রী।' জয়িতা ভদ্র হেসে কথা বলল, কিন্তু তার চোখে সামান্য কৌতূহল টের পেল অর্ণব।

ওদিকে পর্ণশ্রীও হাঁক পাড়ল তাঁর স্বামী রজত ও কন্যা শ্রেয়সীকে। মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এটা অর্ণব আঙ্কেল। খুব ভাল কবিতা লিখত।'

পর্ণশ্রীর কর্তা জানতে চাইল, লিখত মানে? প্রাক্তন কবি? এখন লেখেন না?

অর্ণবের পাশে থাকা জয়িতা পাল্টা মজা করে বলল, 'ছেলেদের সব কবিতা বিয়ের পর হারিয়ে যায়। তারা বান্ধবীদের দেখে কবিতা লেখে। বউদের জন্য লেখে না।'

সবাই হো হো করে হেঁসে উঠল।

কথাটা অবশ্য নেহাত মন্দ বলেনি। এখন সে ক্লাসে কবিতা পড়ায় ঠিকই, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিজে তো তেমন লিখতে পারে না। কেউ লেখা চাইলে প্রবন্ধ বা ফিচার দেয়। কবিতা তো লেখে না।

পর্ণশ্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হল। কলেজ, শিক্ষক, পুরনো বন্ধু—সবাইকে নিয়ে। কিন্তু কোথাও একটা অলিখিত দেওয়াল ছিল। তারা দুজনেই জানত, কিছু কথা বলার নয়। একদিকে পর্ণশ্রীর সঙ্গে রজত, অন্যদিকে অর্ণবের সঙ্গে জয়িতা। ফলে ইচ্ছে থাকলেও ফোন নম্বর বিনিময় হল না। এবারও সঙ্কোচে কেউ ফোন নম্বর চাইতেই পারল না। তবে বরের সঙ্গে আলাপের সময় কায়দা করে পদবীটা জেনে নিয়েছে।

সত্যিই কি ফোন নম্বর চাওয়া যেত না? পর্ণশ্রী নিশ্চয় আপত্তি করত না। কী জানি, তাঁর বর হয়তো মনে মনে ক্ষুন্ন হত। কী জানি, জয়িতা হয়তো ভেবে নিত, এরা নিশ্চয় পরে যোগাযোগ করবে। একটা সন্দেহ দানা বাঁধত। তাই এবারেও সঙ্কোচের দেওয়ালটা থেকেই গেল।

পাঁচ

পর্ণশ্রীরা একটা গ্রুপে এসেছিল। তারা নেমে গেল। অর্ণব ইচ্ছে করেই কিছুটা সময় নিল। ফেরার পথে সেই মাসির দোকানে আরও একবার বসল। বক্সারও আরও উঁচুতে আরও একটা গ্রাম—লেপচা খা। সেখানেও নাকি টুরিস্টরা যায়। হোম স্টেও আছে।

বুলুদা বলে দিয়েছিল, পাথুরে রাস্তা। বিকেলের মধ্যে কিন্তু সান্তালাবাড়িতে নেমে যাবেন। নইলে, ওখান থেকে অটো পেতে সমস্যা হবে। সন্ধের দিকে রাস্তায় হাতি বেরোয়। অটো বা টোটোওয়ালারা আসতে চায় না।

বুলুদার কথামতোই বিকেলের আগেই ওরা সমতলে নেমে এল। একটা টোটোয় চড়ে রাজাভাতখাওয়ায় ফিরেও এল। জয়িতা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অর্ণব বারান্দায় বসে রইল একা। চারপাশে ঝিঁঝিঁর ডাক, দূরে নদীর কলতান। আর মনে ভেসে চলল পর্ণশ্রীর মুখ।

সে ফোনটা হাতে নিল। ফেসবুক খুলল। পর্ণশ্রীর পদবী জানা গেছে। এবার হয়তো পাওয়া যাবে। সার্চ বারে লিখল—Parnashree chaki.

চাকি পদবীটা খুব একটা পরিচিত নয়। সেই বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকি আর ভাষাবিদ জ্যোতিভূষণ চাকির পর আর কারও এমন পদবী শোনেনি। রেয়ার টাইটেল হওয়ার এটা একটা সুবিধা। ফেসবুকে খুঁজতে সুবিধা হয়।

হ্যাঁ, প্রোফাইল আছে। ছবিতে প্রায় চেনা যায়, তবু চোখের কোণে বয়সের রেখা স্পষ্ট। তবু যেন সেই চেনা দীপ্তি অটুট। অর্ণব অবচেতনে স্ক্রল করতে লাগল। পুরনো ছবির নীচে তার হাসি, ভ্রমণের অ্যালবাম, কয়েকটা কবিতা–উদ্ধৃতি—সবকিছুই যেন অর্ণবকে টেনে নিয়ে গেল অতীতে।

কিছুক্ষণ পর সে টের পেল—পর্ণশ্রীও তার প্রোফাইল ঘেঁটেছে। নামের পাশে “Viewed your profile” নোটিফিকেশন দেখে বুক কেঁপে উঠল।

তাহলে কি একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রাখবে! পরে মনে হল, কই, পর্ণশ্রীও তো তার প্রোফাইল দেখেছে। সে তো পাঠায়নি। তাছাড়া, পর্ণশ্রীর পদবী বদল হলেও তার তো হয়নি। এতদিন পর্ণশ্রী তাকে সার্চ করেনি কেন? বা সার্চ করলেও রিকোয়েস্ট পাঠায়নি কেন?

তাই, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আর পাঠানোই হল না।

ছয়

অর্ণব বুঝল, এই নীরবতাই আসলে তাদের সম্পর্কের সংজ্ঞা। একসময়ে যা বলা হয়নি, আজও তা বলার সাহস হল না। হয়তো এই নীরবতাই টিকে থাকবে সারাজীবন, কোনও ভারী প্রতিশ্রুতি বা অনুতাপ ছাড়াই।

ভেতরে গিয়ে দেখল, জয়িতা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার চুল এলোমেলো হয়ে গাল ঢেকেছে। অর্ণব ধীরে গিয়ে বিছানায় বসল, তার হাতটা আলতো করে ধরল। জয়িতার ঘুম ভাঙেনি, তবু আঙুল নড়ল।

অর্ণব এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। বুঝল—বর্তমানই তার সত্যি। অতীতের ছায়া হয়তো ফিরে ফিরে আসবে, কিন্তু তাকে বেঁধে রাখবে না।

সাত

পরদিন সকালে আবার তারা হাঁটতে বেরোল রাজাভাতখাওয়ার স্টেশন চত্বর ঘিরে। প্ল্যাটফর্মে সূর্যের আলো পড়েছে, কুয়াশা গলে গেছে।

জয়িতা বলল, ‘আজ এখানকার ছবি তুলব অনেক। ফিরে গিয়ে ফ্রেমে বাঁধাব।’

অর্ণব মুচকি হাসল। দূরে ট্রেন ঢুকছে, ধোঁয়া উড়ছে। তার চোখে ভেসে উঠল পর্ণশ্রীর হাসি, কিন্তু সে আর পিছনে তাকাল না।

জয়িতার হাত ধরে সে হাঁটতে লাগল।

স্টেশনের লালচে প্ল্যাটফর্মে তখন শুধুই নীরবতা, আর অজানা এক কবিতার অক্ষর—যা লেখা হল না, তবু থেকে গেল মনে।

গোয়েন্দা-কাহিনিও লিখেছিলেন আশাপূর্ণা!

শোভন চন্দ

আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই তাঁর বেড়ে ওঠা। তবে সময় যেন তাঁকে সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছে, করে তুলেছে অনন্যা। একটু মজা করে বলতে গেলে, বাংলা সাহিত্যের রান্না ঘরে ইনি পাকা রাঁধুনি, পরম যত্নে-স্নেহে একের পর এক উপহার আমাদের দিয়ে গেছেন। তৎকালীন সমাজের প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন করে সাহিত্যকে দিয়েছেন তাঁর অনন্য সৃষ্টি, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে তাঁর লেখনীগুণে করেছেন সমৃদ্ধ। তবে কেমন ছিলেন গৃহিনী আশাপূর্ণা, কেমন ছিলেন সবার প্রিয় মাসিমা আশাপূর্ণা দেবী, সেই অজানা -অদেখা স্মৃতিচারণে নানা মজার কথা তুলে ধরলেন আমাদের সকলের প্রিয় ভানুবাবু (সবীতেন্দ্রনাথ রায়)।

আশাপূর্ণা দেবীর সান্নিধ্যে যখন প্রথম যাই তখন আমি নিতান্তই তরুণ, সবে প্রকাশনার কাজে ঢুকেছি। সে সময়ে তাঁর উপন্যাস 'বলয়গ্রাস' ছাপা হচ্ছে। এটি কোনও পত্র-পত্রিকায় বেরোয়নি। আশাপূর্ণা দেবী সরাসরি পাণ্ডুলিপি লিখে দিচ্ছিলেন কিস্তিতে- কিস্তিতে। আমি আনতে গেলাম সম্ভবত তৃতীয় কিস্তি। আমরা দরজায় যেতেই একটি মেয়ে দরজা খুলে আমাদের বসাল, আমরা বসবার পর মেয়েটি জলখাবার দিয়ে গেল। বলল একটু বসুন, মা ঠাকুমাকে খাইয়ে আসছেন।

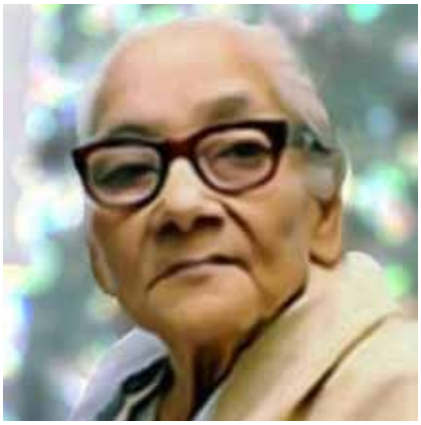

কিছুক্ষণ বাদে আশাপূর্ণা দেবী এলেন। হাতে সুন্দর লাইন টানা পাণ্ডুলিপি। সত্যি বলতে আশাপূর্ণা দেবীর সাথে এক মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আশাপূর্ণা দেবী ও কালিদাস গুপ্ত একরকম আমাদের মাসিমা মেসোমশাই ছিলেন, আশাপূর্ণা দেবীর বাড়ি ছিল প্রথমে দর্জিপাড়ায়, উত্তর কলকাতায়। একান্নবর্তী পরিবার সেকালের কট্টর রক্ষণশীলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন আশাপূর্ণারা। ঠাকুমা ছিলেন কর্ত্রী। তাঁর কড়া হুকুম- বাড়ির মেয়েরা গৃহকর্ম শিখবে শুধু, লেখাপড়ার ধারেকাছে যাবে না। দাদারা পড়তেন গৃহশিক্ষকের কাছে। দাদারা তখন সদ্য স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ লিখতে শিখেছেন। আশাপূর্ণা উল্টো দিকে বসে থাকতেন দাদাদের পড়াশুনো লক্ষ্য করতেন। তাই দেখে আশাপূর্ণা শেখেন লিখতে, কিন্তু সব

উল্টোভাবে, যেহেতু উল্টোদিকে বসে লিখতেন। মেয়ের লেখাপড়ার উৎসাহ দেখে মা রাতে শোওয়ার সময়ে আয়নায় উল্টো লেখা দেখিয়ে কীভাবে সোজা লিখতে হয় তা শেখালেন। শুরু হল মায়ের কাছে বই পড়া ও লেখার প্রথম পাঠ। বাবা হরেন্দ্রকুমার ছিলেন শিল্পী। মা –বাবার শিল্পী মানসিকতার প্রভাবে এইভাবে আশাপূর্ণা সাহিত্যপাঠের জগতে প্রবেশ করলেন। সত্যি বলতে, এক চরম দুঃসাহসে কবিতা লিখে ফেললেন আশাপূর্ণা, নাম দিলেন – 'বাইরের ডাক'। কিছুদিন পরে কবিতাটি শিশুসাথী পত্রিকাতে প্রকাশিত হল।

তখনকার প্রথামতো আশাপূর্ণা দেবীর বিয়ে হয়ে যায় অল্প বয়সেই , বছর পনেরো তখন তিনি। শ্বশুরবাড়ি সেকালের রক্ষণশীল পরিবার।
তখনকার রক্ষণশীল পরিবারে, সমাজে কোন মহিলা লিখছেন এবং সেই লেখা পত্র- পত্রিকায় বেরোচ্ছে কেউ ভাবতে পারত না। কালিদাসবাবু নিজেই ব্যবস্থা করে দেন, যাতে পত্নী রাত্রে হ্যারিকেনের আলোয় লিখতে পারেন। কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে লণ্ঠন, যাতে আলো বাইরে না যায়। লেখা হলে নিজেই পৌঁছে দিতেন পত্র- পত্রিকাতে।

একদিন আশাপূর্ণা দেবী রাতে আমায় ফোন করলেন, ভানু , তোমার মেশোমসাই ও আমি কাল দুপুর বারোটার ট্রেনে শ্বশুরবাড়ি যাব। তুমি কষ্ট করে দুটো বই –একটা "বলয়গ্রাস" আর একটা "নির্জন পৃথিবী" কৃষ্ণনগরের ট্রেনে পৌঁছে দেবে । তাহলে আমার শ্বশুর বাড়িতে মুখ রক্ষে হয়। আমরা ১২ টার ট্রেনে যাব।

সেই মত পৌঁছে দিয়ে বললাম, মাসিমা এবার তাহলে ধারাবাহিকটা শুরু করা যাক মাসিমা হেসে বললেন সামনের মাস থেকে দেব ,প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি । আমি বললাম তাহলে নামটা দিন আগে থেকে বিজ্ঞাপন করতে হবে তো। উনি বললেন ওই প্রতিশ্রুতি দাও না না বরং "প্রথম প্রতিশ্রুতি" দাও । সেই "প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাসের ভিত্তিস্থাপন । ১৩৬৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে প্রথম প্রতিশ্রুতি ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে ।

জন্মদিনে রাধাবল্লভী, দরবেশ চমচমের সঙ্গে আশাপূর্না দেবীর নিজের হাতে ভাজা বেগুনী অন্যতম চিত্তাকর্ষক খাবার ছিল। বড় সুখের দিন ছিল। "প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাস "রবীন্দ্র- পুরস্কার" পেল । ১৯৭৭ সালে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেল। সংসারে অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ হয় না, জ্ঞানপীঠ ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ল কালিদাস বাবুর কঠিন ব্যাধি – ক্যান্সার। তার বয়স ও স্বাস্থ্য বন্ধু প্রিয়জনদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠল, পুরস্কার হাতে নেওয়ার সময় কালিদাস বাবু সুস্থ থাকবেন তো? আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে যেতে পারবেন তো ? বন্ধু বান্ধবরা ঠিক করলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রদানের আগেই কলকাতায় মহাবোধি সোস্যাইটি হলে আশাপূর্ণা দেবীকে এই উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। গুণমুগ্ধ সাহিত্যিক সাহিত্যমোদীদের আন্তরিকতায় সে সংবর্ধনা সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

কালিদাসবাবু চলে যান ১৯৭৮ খ্রীঃ ১৮ই মার্চ। আশাপূর্ণা দেবী জ্ঞানপীঠ পুরস্কার নিতে যাওয়ার আগেই কালিদাস বিদায় নেন। অবশ্য কালিদাস বাবু বিয়ের দিন থেকেই আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তি স্বত্বা সাহিত্যিক স্বত্বা উভয়কেই আগলে রাখতেন। "দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে" উপন্যাসে এই পত্নিকে আগলে রাখার একটি আভাস পাওয়া যায় । প্রায় সুস্থ থাকার শেষ দিন পর্যন্ত আশাপূর্ণা কলম চালনা করেছেন তারপর কলম চালনা আর অন্ন গ্রহণ এক সঙ্গে থেমেছে । ১৯৯৫ খ্রীঃ ১৩ ই জুলাই তিনি পরপারে যাত্রা করেছেন, তবে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজও থেকে গেছে···

ক্রিকেট বিশ্বায়নের পথে একধাপ

ধীমান সাহা

ক্রিকেট আর ফুটবলের তুলনা টানতে গিয়ে একটি ছড়া খুব চালু আছে।

‘পৃথিবীর চারভাগে তিনভাগ জল
ক্রিকেট তুচ্ছ খেলা, খেলা ফুটবল।’

ছড়াটা অনেক আগের লেখা। তখন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার নিরিখে ফুটবলের তুলনায় ক্রিকেট সত্যিই অনেক পিছিয়ে ছিল। কোনও সন্দেহ নেই, ফুটবল এখনও অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু বিশ্বায়নের পথে ক্রিকেটও খুব দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলেছে। এবারের টি২০ বিশ্বকাপ যেন সেটাই আরও একবার বুঝিয়ে দিল।

পরপর দু’বার বিশ্বজয়ী ভারত। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী মেতে আছে উল্লাসে। টি২০ ঘরানায় একসঙ্গে তিনটি বিরল নজির। প্রথমত, এই প্রথম কোনও দেশ তিনবার বিশ্বজয়ী হল। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম পরপর দু’বার কোনও দল বিশ্বজয়ের স্বাদ পেল। তৃতীয়ত, এই প্রথম কোনও দেশ নিজের দেশের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন হল। টিম ইন্ডিয়ার এই দুরন্ত উত্থান নিয়ে দিকে দিকে চর্চা তো চলছেই। কিন্তু এই সাফল্যের উল্লাসে অনেক বিষয় হয়তো ততখানি আলোকিত হচ্ছে না। তেমনই একটি বিষয় হল, ক্রিকেটের গ্লোবালাইজেশন, অর্থাৎ ক্রিকেটের বিশ্বায়ন।

১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয় ভারতের ক্রিকেটে একটি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতোই ঘটনা। ক্রিকেটকে ঘিরে উন্মাদনা যেন নতুন এক মাত্রা পেয়েছিল। চার বছর পরের বিশ্বকাপে, অর্থাৎ ১৯৮৭ তে ভারত আর পাকিস্তান ছিল আয়োজক। সেবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল আটটি দেশ। এবার টি২০ বিশ্বকাপে খেলল ২০টি দেশ। এর থেকেই বোঝা যায়, ক্রিকেটের বিস্তার কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। কোনও দলই হেলাফেলা করার মতো দল নয়। আবির্ভাবেই চমক দিল ইতালি। যে ইতালিকে আমরা চিনি মূলত ফুটবলের জন্য। পরপর দু'বার তারা ফুটবল বিশ্বকাপের মানচিত্রেই নেই। অথচ, ক্রিকেটে আবির্ভাবেই সাড়া ফেলে দিল। ক্রিকেটে বহুচর্চিত দলগুলির বাইরে এবার অংশ নিয়েছিল আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, নেপাল, ইতালি, স্কটল্যান্ড, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। এইসব দেশ যে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে, কয়েক বছর আগেও কি ভাবা গিয়েছিল? সব দেশই কিছু না কিছু চমক দেখিয়েছে। আগামী দিনে বড় শক্তি হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিয়েছে।

জিম্বাবোয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বকাপের আঙিনায় ছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, মূলস্রোত থেকে কিছুটা যেন হারিয়ে গিয়েছিল। এবার তারাও অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে গ্রুপ লিগ থেকে ছিটকে দিয়ে সুপার এইটে উঠে এল। আড়াই বছর আগে ভারতের মাটিতে হয়েছিল ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। দু'বারের বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ যোগ্যতা অর্জন করতেই পারেনি। এবার তারাও সুপার এইট পর্যন্ত দুরন্ত লড়াই উপহার দিয়ে গেল।

ক্রিকেটের আঙিনায় এতদিন অন্ধকারে পড়ে থাকা এই সব দল কীভাবে উঠে এল? কিছুটা কৃতিত্ব অবশ্যই আইসিসি-র। ক্রিকেটকে আর নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ভূখণ্ডে আটকে রাখলে হবে না, তাকে বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে, এই ভাবনা নিয়ে কাজ করে চলেছে আইসিসি। তারই বড় এক পদক্ষেপ হল লস এঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের অন্তর্ভূক্তি। ছেলেদের ক্রিকেট এবং মেয়েদের ক্রিকেট— দুই ঘরানার ক্রিকেটই জায়গা পেয়েছে অলিম্পিকে। সেখানেও খেলবে কুড়িটি করে দেশ। ক্রিকেটের মুকুটে 'অলিম্পিক গেমস' এর পালক ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে দেবে। বিভিন্ন দেশ এখন থেকেই নিঃশব্দে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। অলিম্পিকের আঙিনায় হয়তো বড় কোনও চমক অপেক্ষা করছে।

শুধু কি ছেলেদের ক্রিকেট! মেয়েদের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বাড়ছে। কয়েক বছর আগেও যেসব দেশে পুরুষ ক্রিকেট দলই ছিল না, সেইসব দেশে এখন মহিলা ক্রিকেট দলও তৈরি হয়ে গেছে। এটা বিরাট একটা সাফল্য। মেয়েদের ক্রিকেটে স্পনসর আসছে, পারিশ্রমিক বেড়েছে, টিভিতে নিয়মিত সম্প্রচার হচ্ছে। এমনকী ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগও চালু হয়েছে। আইসিসি-র পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। কয়েকদিন আগেই হয়ে গেল অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ। অনেক বছর ধরেই চলছে। কিন্তু এবার তা যেন পৌঁছেছিল অন্য এক উচ্চতায়। বোঝা গেল, বিভিন্ন দেশের সাপ্লাই লাইন তৈরি। আগামী দিনের ক্রিকেটকে কারা শাসন করবেন, সেই রূপরেখাও যেন তৈরি।

ক্রিকেটের গায়ে এমনিতেই লেগে আছে

অনিশ্চয়তার তকমা। এত এত দল উঠে আসায় সেই অনিশ্চয়তা আর রহস্য যে আরও বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। ভারতে আইপিএল দিয়ে শুরু হয়েছিল ক্রিকেটের জমজমাট ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে। এমনকী, মধ্যপ্রাচ্য ও মার্কিন মুলুকেও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চলছে রমরমিয়ে। বিভিন্ন দেশের তারকা ক্রিকেটাররা অংশ নিচ্ছেন সেইসব লিগে। খুব দ্রুত চীন, জাপানের মতো দেশও বিশ্বকাপের আঙিনায় উঠে এলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

একটা সময় বলা হত, ক্রিকেট হাতে গোনা কয়েকটি দেশের খেলা। সেই মিথ ভেঙে গেছে। আমাদের দেশেও বলা হত, ক্রিকেট মূলত শহুরে খেলা। বড় বড় শহর থেকেই ক্রিকেটাররা উঠে আসতেন। সেই মিথও ভেঙে দিয়েছে আইপিএল। জেলা শহর, মফস্বল শহর, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও থেকে এত এত ক্রিকেটার উঠে এসেছেন, সংখ্যাটা তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো।

এবারের রনজি ট্রফির কথাই ভাবুন। কেউ সুদূরতম কল্পনাতেও ভাবতে পেরেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর রনজি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে! যাদের ক্রিকেটের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছিল না। প্র্যাকটিস করার মাঠও ছিল না। তারাই কিনা সবাইকে চমকে দিয়ে রনজি চ্যাম্পিয়ন! সেমিফাইনালে হারাল বাংলাকে, ফাইনালে হারাল কর্ণাটককে। রনজি ট্রফির ইতিহাসে অন্যতম সেরা চমক।

দেশে ও বিদেশে এভাবেই উঠে আসছে নানা শক্তি। আমরা যাদের বেড়ে ওঠার খবরও রাখি না। এবারের বিশ্বকাপ প্রদীপের তলায় জমে থাকা সেই অন্ধকারে কিছুটা আলো দেখাল। এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে বিশ্বায়নের পথে আরও একধাপ এগিয়ে দিল।

গম্ভীর নিজেই তো তারকা হতে চাইছেন

ধীমান সাহা

ভারত কাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতল, সেটাই মাঝে মাঝে গুলিয়ে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে অবশ্যই নিউজিল্যান্ডকে। কিন্তু কোচ গৌতম গম্ভীরের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তিনি হয়তো বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের হারিয়েই বিশ্বকাপ জিতলেন।

বিরাট এবং রোহিত— দুজনই দু'বছর আগে ভারতকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার দিনেই টি২০ ঘরানা থেকে অবসর ঘোষণা করেন। কিন্তু তারপরও তাঁদের ভূত যেন তাড়া করছে গুরু গম্ভীরকে। ভারত বিশ্বকাপ জিতল, এ

তো আনন্দের খবর। খেলোয়াড়দের যেমন অভিনন্দন প্রাপ্য, কোচেরও অভিনন্দন প্রাপ্য। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিনেই এভাবে বিরাট-রোহিতদের খোঁচা দেওয়ার কোনও দরকার ছিল?

গম্ভীর মশাই বলতেই পারেন, 'আমি তো কারও নাম করে কিছু বলিনি।' কিন্তু তাঁর ইঙ্গিত কোনদিকে, এটা বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তিনি এসে নাকি তারকা প্রথা শেষ করতে চাইছেন। এতদিন ভারতীয় ক্রিকেট নাকি তারকা প্রথায় আচ্ছন্ন ছিল। মিডিয়াও নাকি তারকাদের নিয়েই মাতামাতি করেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিন এগুলো বলার মানে কী?

আসলে, অপেক্ষায় ছিলেন। চ্যাম্পিয়ন হতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। বিরাট-রোহিতদের চাই না, সরাসরি বলতে পারছেন না। ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, তারকাদের জায়গা নেই। শেষ দুটো একদিনের সিরিজে বিরাটের কী অবদান, সেটা গম্ভীরবাবু এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন! বিরাট-রোহিতরা তো টেস্ট থেকেও অবসর নিয়েছেন। ভারতকে কেমন লেজে গোবরে হতে হচ্ছে, সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

নানা কারণে, ধোনি বা বিরাটের ওপর গম্ভীরের পুরনো কিছু রাগ আছে। সেগুলো কিছুতেই ভুলতে পারেন না। নানা সময়ে সেগুলো বেরিয়ে আসে। ২০১১ বিশ্বকাপে ধোনি শুধু ছক্কা মেরে জেতাননি, দলের কঠিন সময়ে দুরন্ত একটা ম্যাচজেতানো ইনিংস খেলেছিলেন। হ্যাঁ, ফাইনালে গম্ভীরের ইনিংসটাও মূল্যবান। কিন্তু জনতা যদি ধোনির কৃতিত্বকে বাড়তি গুরুত্ব দিতেই চায়, এত গোঁসা করার তো কিছু নেই। মুখে বলছেন, তারকা প্রথায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু তারকাদের ছেঁটে ফেলে নিজেই তো তারকা হতে চাইছেন।

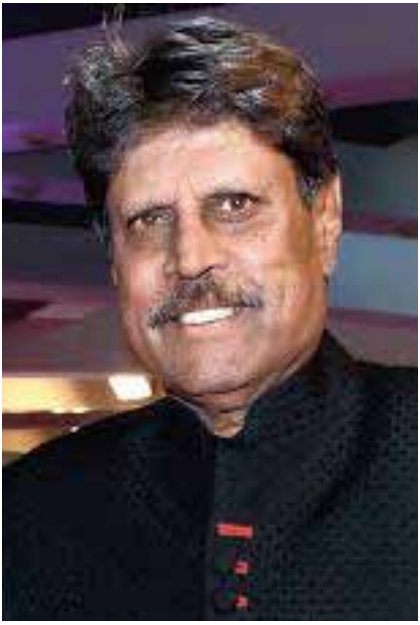

কপিলের কথা এতদিনে মনে পড়ল!

নির্মল দত্ত

সব ভাল, যার শেষ ভাল। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের পর এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ভারত যে এবার অন্যতম ফেবারিট দল, তা নিয়ে বিশ্বকাপের আগেও কারও সংশয় ছিল না। দেশ বিদেশের অনেক বিশেষজ্ঞই এগিয়ে রেখেছিলেন ভারতকে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং— সব ব্যাপারে ভারত অন্যান্য দলকে টেক্কা দিয়ে গেল।

কিন্তু তার থেকেও ভাল লাগছে গ্যালারিতে দুজনের বিশেষ উপস্থিতি দেখে। ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিলদেব। এবং ২০১১ বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি (তিনি আবার একইসঙ্গে ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক)। যে কোনও কারণেই হোক, ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে আমেদাবাগে এই দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে দেখা যায়নি। শোনা যায়, বোর্ডকর্তারা নাকি তাঁদের আমন্ত্রণই জানাননি। অন্তত কপিলদেবকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, তা তো তিনি নিজেই প্রকাশ্যে বলেছেন। তবে কি কপিলদেবের নামটা জয় শাহ অ্যান্ড কোং ভুলেই গিয়েছিলেন? ফাইনালের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এর-তার বাড়িতে হাজির হয়ে যাচ্ছিলেন জয় শাহ। সেই তালিকায় বলিউডি তারকারাও ছিলেন। বলিউডের তারকাদের বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ঘটা করে ছবি তুলে সেই

ছবি বোর্ডের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট হচ্ছে। অথচ, কপিলদেবের বাড়িতে যাওয়ার সময় পাননি! তাছাড়া, জয় শাহ তখন সরকারিভাবে বোর্ডের সচিব ছিলেন। সভাপতির চেয়ারে ছিলেন রজার বিনি। ভারতীয় ক্রিকেটে যাঁর সবথেকে বড় পরিচিতি তিরাশির বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য হিসেবে। কপিলদেব কে, ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর উচ্চতা ও অবদান ঠিক কতটা, জয় শাহ না জানতেই পারেন। তাঁর যা ক্রিকেটচর্চার দৌড়, তাতে না জানাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রজার বিনি তো জানতেন কপিলদেব কে। তিনি তো আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন। আসল কথা হল, অনুমতি নেই। মোদ্দা কথা, তুমি সভাপতি হতে পারো, কাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, কাকে হবে না, তুমি নাক গলাতে এসো না। এমনকী পরামর্শ দিতেও এসো না। এই দেওয়াল লিখনটুকু পড়তে রজার বিনির ভুল হওয়ার কথা নয়। তাই তিনিও উদাসীনই থেকেছেন। এমনকী কপিল যখন আমন্ত্রণ না পাওয়ায় অভিমানের কথা বলেছিলেন, তখনও বোর্ডের দিক থেকে কোনও দুঃখপ্রকাশের বার্তা আসেনি।

আসলে, ক্রিকেটের এই গৌরব, এই জনপ্রিয়তা যে কপিলদেব, ধোনিদের জন্যই এসেছে, এই সহজ কথাটা জয় শাহ অ্যান্ড কোম্পানি ভুলে যায়। তাঁরা ভেবে নেন, তাঁদের জন্যই বোধ হয় ক্রিকেট এত জনপ্রিয়। জয় শাহ আইসিসি-র সভাপতি। অথচ, ম্যাচের পরদিন দেখা গেল, তিনি কোচ গৌতম গম্ভীর আর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে সঙ্গে নিয়ে আমেদাবাদের কোনও একটি মন্দিরে পৌঁছে গেলেন। আচ্ছা, এটা আইসিসি চেয়ারম্যানের কাজ? চেয়ারে বসলেই হয় না, চেয়ারের ওজনটা বুঝতে হয়। সেইসঙ্গে নিজের ওজনটাও বুঝতে হয়। অমিত শাহর পুত্র এতসব বুঝবেন, এতখানি আশা না করাই ভাল।

সেই তো থ্রিলার আর ভূত

মলয় সেন

গত কয়েকবছরে একটা অদ্ভুত ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। শহরের নানা প্রান্তে বিশাল হোর্ডিং। সিনেমার নয়, সিরিয়ালেরও নয়। আসলে, ওয়েব সিরিজ। সিনেমা হল, টিভির বাইরেও খুলে গেছে অন্য একটা দিগন্ত। অর্থাৎ, হলে যাওয়ার দরকার নেই। টিভির সামনে বসারও দরকার নেই। মোবাইলেই মগ্ন থাকুন। সেখানেই যা দেখার, দেখে নিন।

একের পর এক ওটিটি চ্যানেল হাজির হয়ে গেছে। নিত্যনতুন কনটেন্ট নিয়ে তারা হাজির। বিনোদন জগতের নতুন দরজা যেন খুলে গেছে। কত নতুন নতুন কনটেন্ট নিয়ে ছবি হচ্ছে। প্রথমত, এখানে বাজেট অনেকটাই কম। ফলে, এমন অনেক কনটেন্ট শুনে প্রোডিউসার পালিয়ে যান। কিন্তু এখানে অল্প বাজেট। ফলে সেইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অনায়াসে করা যায়। বড়সড় তারকা নিতে পারলে ভাল। না নিলেও ক্ষতি নেই। একটা পরিচিত মুখ থাকলেই হল। তিনি টেনে নিয়ে যাবেন। বাকি দু'একজন অল্প পরিচিত। বাকিরা আনকোরা হলেও চলে যায়।

কিন্তু অল্প টাকায় ছবি হলে তার কিছু ভাল দিক যেমন থাকে, তেমনই কিছু বেনোজলও ঢুকে পড়ে। যে পারছেন, পরিচালক হয়ে যাচ্ছেন। রিসার্চের নামে যা খুশি গেলানো হচ্ছে। শহরজুড়ে হোর্ডিং, তার ওপর সোশ্যাল মিডিয়ায় লাগাতার ক্যাম্পেনিং তো আছেই। লোকে ভাবছেন, দারুণ কিছু কনটেন্ট। কিন্তু একটা বা দুটো পর্ব দেখার পরই মোহভঙ্গ হতে সময় লাগছে না।

আবার কোনও কোনও ওয়েব সিরিজ যেন সিরিয়ালেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। মেগা সিরিয়াল যেমন বছরের পর বছর চলে, এটাও তেমনি দশ এপিসোড, বারো এপিসোডে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সিরিয়াল যদি নেশা ধরাতে পারে, তাহলে ওয়েব সিরিজই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এখানেও ঢুকে পড়ছে পরকীয়া। ঢুকে পড়ছে মেলোড্রামা। ঢুকে পড়ছে পারিবারিক কূটকচালি। সাসপেন্সের নামে অকাতরে ঢুকে পড়ছে ভায়োলেন্স। আর যৌনতার সুড়সুড়ি তো আছেই।

সবকিছুরই নিজস্ব খদ্দের আছে। কেউ খুনখারাপি দেখতেই ভালবাসেন। কেউ ভালবাসেন সারাক্ষণ ঝগড়া দেখতে। কূটকচালি তো দারুণ উপাদেয়। সিরিয়ালে দেখে নিজের সংসারে সেগুলো প্রয়োগ করা। মফস্বলের কত পরিবারে নিত্য অশান্তি সেইসব কূটকচালির প্রয়োগকে ঘিরে। এসব নিয়ে আর্থসামাজিক সমীক্ষা হওয়াটা খুব জরুরি। শুধু কিছু সিরিয়াল জনজীবনকে কতখানি বিষিয়ে দিয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। সেই প্রবণতা এবার কি ওয়েব সিরিজের হাত ধরেও চলে আসছে!

ইদানীং নতুন একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে, সেশন ওয়ান, সেশন টু। মানে, সেশন ওয়ানে আট–দশ পর্ব। এমন জায়গায় শেষ করা হচ্ছে, যা 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। 'অন্তরে অতৃপ্তি' থেকেই যাচ্ছে। সেই অতৃপ্তি থেকেই হাজির হয়ে যাচ্ছে সেশন টু। অর্থাৎ, আরও আট–দশ পর্ব। আসলে, যেন মেগা সিরিয়ালেরই কন্টিনিউয়েশন।

ভাল কনটেন্ট অবশ্যই স্বাগত। নতুন প্রযুক্তি থেকেও মুখ ফিরিয়ে থাকার উপায় নেই। কিন্তু সেই প্রযুক্তির হাত ধরে, নতুন ধারার হাত ধরে আবার যদি সেই বিষবাষ্প ঢুকে পড়ে, তা বেশ উদ্বেগের। ওয়েব সিরিজের শুরুর দিনগুলোয় কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গিয়েছিল, যাক, সিরিয়ালের কূটকচালি থেকে কিছুটা অন্তত মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু গত কয়েক বছরে আস্তে আস্তে ওয়েব সিরিজেরও সিরিয়ালীকরণ হয়ে গেল। ভাল ছবিকে যেমন আর্ট ফিল্ম বলে দাগিয়ে দেওয়া হত, এখানেও ভাল কনটেন্ট আবার সেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে না তো!

স্নিগ্ধ গ্রাম কোলাখাম

মেঘের চিঠি বয়ে বেড়ানো এক খাম। শান্ত, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম— কোলাখাম। হুল্লোড় নেই, আছে অনাবিল শান্তি। এমন নিরালায় অলসভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায় কত মুহূর্ত। ফিরে এসে লিখলেন **সুব্রত মণ্ডল**।

স্কুলের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি কোলাখাম যাব ঠিক করলাম। জায়গাটার কথা আগেও শুনেছি। কয়েকটা ভিডিও দেখে কিছু প্রাথমিক ধারণাও হয়েছে। আসলে, আমার কাছে পাহাড় মানেই দার্জিলিং নয়। এইসব পাহাড়ি গ্রাম আমাকে আরও বেশি করে টানে।

রাতের ট্রেনে টিকিট পাওয়া বেশ ঝামেলার। নতুন ট্রেন বন্দে ভারত জিন্দাবাদ। রিজার্ভেশন পেতেও সমস্যা হল না। জোগাড় করলাম হিমালয়ান ওডিসির বুকিং। কথা হল কো-ওনার অনিরুদ্ধ সুরের সঙ্গে। সেইমতো কেয়ারটেকার কুমার রাই আমাদের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ একটা রুমের ব্যবস্থা করলেন। চার দিনের পিকআপ, ড্রপ ও সাইট সিয়িংয়ের জন্য একটা গাড়ি প্যাকেজে করে নিলাম। বিরু তামাং কোলাখামেরই ছেলে। চার দিনের প্যাকেজ ও ১৩ হাজার টাকায় করে দেবে ঠিক হল। বন্দে ভারত দেড়টা নাগাদ এনজিপি পৌঁছাল।

বিরু তামাং স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল। ট্রেনের মধ্যেই লাঞ্চ হয়ে গেছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চেপে বসলাম। গাড়ি তিস্তা ব্যারেজ, গজলডোবা, ডামডিং এমবিওক হয়ে লাভার রাস্তা ধরল। রাস্তায় ডুয়ার্সের জঙ্গল আর বেশ কিছু চা-বাগান চোখে পড়ল। একটু রোদ, একটু মেঘলা, একটা অদ্ভুত ভাল লাগার আবেশ যেন আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়, জঙ্গলের

সান্নিধ্য সত্যিই মানুষকে অনেক বেশি উদার করে তোলে। কোনও রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হতাশা নেই, শুধুই একরাশ ভাল লাগা। লাভা পৌঁছানোর ঠিক আগে নেওড়াভ্যালির ভিতরে চেকপোস্ট ক্রস করে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। এখান থেকে কোলাখাম সাত কিলোমিটার রাস্তা। জায়গায় জায়গায় একটু ভাঙাচোরা। কিন্তু আশপাশের রোমাঞ্চ এতটাই যে সেই ভাঙাচোরা রাস্তায় এতটুকুও বিরক্তি এল না।

সন্ধ্যে নামার ঠিক আগে পৌঁছে গেলাম কোলাখাম গ্রামে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন হোমস্টে। তার মধ্যে ক্যাসিরো ইন, দ্য নেস্ট, স্টার হলিডেজ, দ্য ট্রেল্‌স এই হোমস্টে গুলো উল্লেখ-যোগ্য। হোমস্টে হিমালয়ান ওডেসির ব্যালকনি থেকে সামনের উপত্যকা চমৎকার দেখা যায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সামনের কাঞ্চনজঙ্ঘা কাল দেখা যাবে। এখানে বসে থাকলে মনে হয়, অলসভাবে সময় বয়ে যাক। মনে হয়, আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই। হোমস্টের ঘরোয়া খাবার আমাদের সত্যিই তৃপ্ত করেছিল। এই যেমন হাতে গড়া রুটি, চিকেন, সবজি, ডাল আলু-পরোটা, চা। বৃষ্টি হলেই আবার এখানে কারেন্ট চলে যায়। হোমস্টের কোনও রুমে টিভি নেই। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। নাই বা দেখলাম টিভি। টানা ব্রেকিং নিউজ থেকে অন্তত কয়েকদিনের বিরতি। মেঘ রোদ্দুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েকটা দিন কেটে যাবে। আর লিখব ডায়েরি। সঙ্গী আছে কিছু বই। রাতের খাবার খেয়ে একটু বাইরে এসে দাঁড়ালাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, তার মাঝে ব্যালকনি জুড়ে বিভিন্ন ফুল আর অর্কিডের বাহার অসাধারণ লাগছিল।

পরের দিন আকাশ ভালই ছিল। খুব ভোরে উঠে পড়লাম কিছু ছবি তুলব, আর গ্রাম ছেড়ে পাইন গাছের জঙ্গলের দিকে রাস্তা ধরে কিছুটা দূর হেঁটে আসব বলে। কিছুটা দূরে যেতেই গ্রামের চতুষ্পদেরা আমাদের সঙ্গী হল। যতদূর হেঁটে গেছি ওরা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। আবার যখন ফিরছি তখনও ওরা সঙ্গেই ছিল। ফিরে এসে বেলার দিকে বেড়িয়ে এলাম লাভা, নোকদাঁড়া,

রিশপ আর টিফিনদাঁড়া ভিউ পয়েন্ট। মূল রাস্তা থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় কিলো মিটার খানেক পথ একটা ছোটখাটো ট্রেক হয়ে। আমাদের সঙ্গে ছোট ছেলে ও মেয়েও বেশ উপভোগ করতে লাগল।

রাতে বৃষ্টি নামল। সকালে কিছুটা পরিষ্কার। পৌঁছে গেলাম ছাঙ্গে ফলস। সেখান থেকে উপরে উঠে এসে নেওড়া ভ্যালির ভিতর দিয়ে রাচেলা টপ গেলাম। রাস্তাটা বেশ এবড়ো খেবড়ো। লাভা বাজারের বিজয়কুমার তার বোলেরো গাড়িতে করে আমাদের রাচেলা টপে নিয়ে গেল। উপরে উঠে সম্মোহিতের মতো অনেকক্ষণ কাটালাম। শুধু মেঘ আর কুয়াশা। দূরে পর্বতের দর্শন তাই হল না। লাভা ফিরে এলাম। পথের ধারে লাভা বাজারের মুখে লামু ফুড সেন্টারে গরম গরম ওয়াই ওয়াই, চিকেন মোমো আর নুডলস খেলাম। তারপর গেলাম মনাস্ট্রি। চারটের সময় প্রার্থনা শুরু হল। এই প্রথম মোনাস্ট্রির ভিতর ছোট–বড় নানান বয়সী লামাদের সঙ্গে পুরো প্রার্থনা পর্ব উপভোগ করলাম।

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের রুম থেকে কর্ণবিদারক আওয়াজ ভেসে আসছে... ও সাকিরে, সাকিরে সাকি.... বুঝলাম কালরাত্রে যে চারজন মেয়ে এই হোমস্টেতে এসে উঠেছে, তারাই আনন্দ ফুর্তি করছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা নির্জনতাকে খানখান করে দিচ্ছিল শহুরে এই মেজাজ। কিছুটা রাগই হচ্ছিল। এরা কেন এই শান্ত গ্রামে আসে। এটা যে হুল্লোড় করার জায়গা নয়, এটুকুও বোঝে না! কাল রাত্রে আরও একজন বয়স্ক কাপল এই হোমস্টেতে এসেছেন। তাঁদের কথা ভেবেও খারাপ লাগছিল। কোলাখাম বিখ্যাত অসংখ্য পাখির গুঞ্জনের জন্য। বোধহয় তারাও এই রাত্রে ঘুমোতে না পেরে বিরক্ত।

ভ্রমণ শেষে পরের দিন পাহাড়জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেরা সঞ্চয় হয়ে থাকবে হোম-স্টের সামনে কুমার রাই ও তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের ছবিখানা। অনেক অভিজ্ঞতা আর ভাল লাগার আবেশ নিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

কুয়াশাঘেরা ছোট্ট গ্রাম পাবং

নূপুর রায়

কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম পাবং। গুটি কয়েক ঘর বাড়ি, একটা প্রাইমারি স্কুল, দু চারটে হোম স্টে, দুটো বিলাসবহুল ফার্ম হাউস। এ বাদে এখানে সত্যিই আর দেখার কিছুই নেই। তবে যা আছে তার হল অনাঘ্রাতা, অসামান্যা প্রকৃতি। চারিপাশে ঘিরে থাকা ন্যাওড়া ভ্যালির বিস্তীর্ণ জঙ্গল, কান পাতলেই ভেসে আসা পাখির কূজন আর মেঘের গায়ে লেগে থাকা বুনো ফুলের ঘ্রাণ। এমন একটা জায়গায় দু একদিন কাটিয়ে গেলে এমনিতেই মন ভাল হয়ে যায়।

কুয়াশার ওড়না জড়ানো নীলচে সবুজ পাহাড়, এলাচের ক্ষেত, ঝাড়ু গাছের ক্ষেত চিরে নিকষ কালো একটা পিচের রাস্তা পাকদণ্ডীর মতো উঠে গেছে একেবারে উপরে, ওই সবুজে মোড়া পাহাড়ের মাথায়। ওটাই হল চারখোল।

কালিম্পঙ থেকে পাবং আসার রাস্তাটাও অসাধারণ। মন কেড়ে নেওয়া একান্ত আপনজনের মতো। প্রতি মুহূর্তে ঘন সবুজ বর্ষণস্নাত প্রকৃতি দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে বলে, এই তো এলে, একটু জিরিয়ে গেলে না হয়।

পথের সৌন্দর্য বড়িয়েছে দুই সহোদরা গ্রাম রেলি আর পলা আর তাদের নিজস্ব দুই নদী। ভরা বর্ষায় ঝমঝমিয়ে পাথর ডিঙিয়ে নেচে নেচে বয়ে চলেছে চপলা বালিকার মতো। খুব ইচ্ছে ছিল পা ডুবিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করি। বলি, আসবো আবার। এই তো চিনে গেলাম। সে আর হয়ে ওঠেনি।

পাবংয়ে আমরা উঠলাম ভট্টরাই হোমস্টে তে।। সম্ভ্রান্ত নেপালী ব্রাহ্মণ পরিবারের নিজস্ব বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তিনটে ঘরেই পর্যটকদের থাকার

ব্যবস্থা। নিজস্ব ক্ষেত খামার, গোয়ালঘর, কাঠের দোতলা বসত বাড়ি, প্রশস্ত উঠান— সব মিলিয়ে খুব সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। পুজো উপলক্ষে শহর থেকে আত্মীয় স্বজন এসেছেন। আর সঙ্গে যোগ দিয়েছি আমরা তিনজন। পুরো বাড়ি জুড়ে উৎসবের আমেজ। খুব সহজেই আমরা এবাড়ির সকলের সঙ্গে মিশে গেলাম।

বাধ সাধলো প্রকৃতি। আগের রাত থেকে যে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে, এখানে এসে তা আরও প্রবল আকার ধারণ করল। টিপ টিপ, রিমঝিম, ঝমঝম কোনও উপমাতেই তাকে আর বেঁধে রাখা গেল না। ছোটবেলায় পরীক্ষায় খুব কমন একটা রচনা ছিল— 'একটি বর্ষণ মুখর দিনের অভিজ্ঞতা'। এর যথার্থতা জীবনের প্রথমবার মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম। আর বৃষ্টি একটু ধরতেই ছাতা সম্বল করে সোজা গ্রামের পথে।

প্রকৃত অর্থে গ্রাম বলতে যা বোঝায় এখানে তার রূপ কিছুটা ভিন্ন। পাহাড়ের কোলে অনেক সময় ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে দেশলাই বাক্সের মতো হঠাৎ করে একটা একলা বাড়ি নজরে আসে। এই হোমস্টে-টা অনেকটা তেমনি। বেশ কিছুটা এলাচের ক্ষেত পেরিয়ে আসতে হয়। এরপর ইতস্তত কিছু ঘর বাড়ি, নতুন তৈরি হচ্ছে এমন কিছু হোমস্টে, আর তার পর একটা প্রাইমারি স্কুল। উপরে ওঠার পথে রয়েছে অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন কিছু ফার্ম স্টে। পাবং থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে চারখোল গিয়ে ফিরে আসা যায়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় আমরা সেভাবে যাইনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম প্রাইমারি স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেখানেই দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়েছে। সারা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দ করছে। আমরাও সেই উৎসবে সামিল হলাম। পুজো শেষে প্রসাদ খেয়ে টিকা লাগিয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার আরেক প্রস্থ বৃষ্টি। তারপর এল সেই মায়াবী সন্ধে। একটা একটা করে দূরের পাহাড়ে জ্বলে উঠল আলো। বিন্দু বিন্দু সেই আলোগুলো জুড়ে গিয়ে তৈরি হল আলোর মালার। হিরের নেকলেসের মতো দ্যুতি ছড়ালো মেঘের গায়ে। এক সুতোয় বাঁধা পড়ল দূরপিন দাঁড়া, কালিম্পং, আলাগড়া থেকে সুদূর ভূটানের কিছু অংশ।

দূরের পাহাড়ের আলো দেখার সৌভাগ্য আগে হলেও, এত সুন্দর নির্দিষ্ট আকৃতি আগে কখনও দেখিনি। আবারও মুগ্ধ হলাম। কিছু মুহূর্ত লেন্সবন্দি হল। যা চর্মচক্ষে দেখতে পাইনি তা মানসচক্ষে কল্পনা করে নিলাম। আফসোস একটাই, আবহাওয়া ভাল থাকলে এ বাড়ির উঠান কিংবা জানালা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা– সহ হিমালয়ের একটা বিস্তৃত রেঞ্জ দেখা যায়। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাইনি।

খাওয়ার টেবিলে কথায় কথায় গল্প জমে উঠল। কার্শিয়াং থেকে এবাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে এসেছেন কাকু –কাকিমা। দু'জনই অধ্যাপক। ভাল বাংলা জানেন। ওনাদের কাছ থেকেই জানলাম পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, চাকরি–সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা। জানলাম এই পাবং এর কথা। ১৯২০ সালে দূরপিন দাঁড়াতে আর্মি ক্যাম্প তৈরি হলে ওখানকার জনবসতিকে পাবং ও কাফের গাঁও তে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ওনারা সেই ভাবেই এখানে এসেছেন। কাকু নিজে হাতে নতুন স্বাদের খাসির মাংস রান্না করে খাওয়ালেন। এই মাংস দু'দিন ধরে সংরক্ষিত হয়েছে কাঠের উনুনের তাপে, ফলে একটা আনকমন ফ্লেভার ছিল। খাওয়ালেন নিজের হাতে তৈরি স্পেশাল পান, মিষ্টি আরও কতকিছু। বলাবাহুল্য, এগুলোর কোনওটাই আমাদের প্রাপ্য পরিষেবার আন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিছু মানুষ এভাবেই মনের কাছাকাছি চলে আসেন। পরের দিন এই ভালোলাগাটুকু সঙ্গে নিয়েই চলে যাব চারখোল। ওখানেই কাটিয়ে আসব বাকি দুটো দিন।

ISSN 2445 5657 | bengaltimes.in